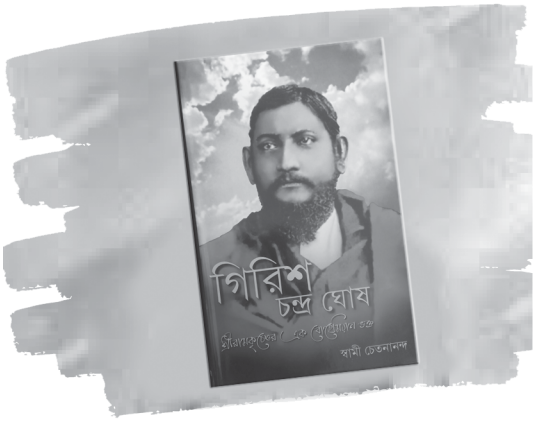

গিরিশচন্দ্র-কথা

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

স্বামী চেতনানন্দ। *গিরিশচন্দ্র ঘোষ : শ্রীরামকৃষ্ণের এক বোহেমিয়ান ভক্ত*। উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২১। পৃষ্ঠাসংখ্যা : কুড়ি + ৫৮০। ২০০.০০ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহে তো বটেই, বাংলার নবজাগরণের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি কবি, নাট্যকার, গল্পকার, অভিনেতা ও পরিচালক—ব্রিটিশ শাসকদের ভাষায় 'Father of the Native Stage'। তাঁর চরিত্রে ইতিবাচক আর নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের আশ্চর্য বুনন। একদিকে তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, প্রবল শারীরিক ক্ষমতা, করুণাপূর্ণ হৃদয়, নির্ভীক সত্যবাদিতা। অপরদিকে তিনি পানাসক্ত, যৌবনে স্বেচ্ছাচারী, সামাজিক শিষ্টাচারের প্রতি উদাসীন। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত নানা জনশ্রুতি আর গুজব উপেক্ষা করে বিরল সৃজন-ক্ষমতার অধিকারী এই প্রতিভাধর মানুষটিকে অনুধাবন করা, তাঁর এক তথ্যনিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা তাই বড় চ্যালেঞ্জ। সে-সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র নিজেও সচেতন ছিলেন বিলক্ষণ। তাই জনৈক লেখক তাঁর জীবনী লেখার অনুমতি চাইলে তিনি বলেছিলেন, ''... যে আমাকে জানতে চাইবে, আমার লেখার মধ্যেই সে আমাকে পাবে।" (পৃঃ ৭) অর্থাৎ কবিকে তাঁর জীবনচরিতে খুঁজতে চেষ্টা না করার চিরন্তন নিষেধ।

সুখের কথা, বহু গবেষণামূলক গ্রন্থের জনক, বিদগ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী চেতনানন্দজী গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনার সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন; এবং দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চায় অধিগত মুনসিয়ানা তাঁকে জয়যুক্ত করেছে। এই গ্রন্থ গিরিশচন্দ্রের সমগ্র জীবনপথের কাহিনি যার শুরুতে তিনি স্বীকার করছেন 'আমি পাপী' (এটিই প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম), আর যে-গ্রন্থের পরিশেষে তিনি ঘোষণা করছেন, ''ঠাকুর আমাকে দেবতা করে দিয়েছেন। আমাকে দেখ, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের মিরাকেল।"

চেতনানন্দজীর মূল ইংরেজি গ্রন্থটি—'Girish Chandra Ghosh—A Bohemian Devotee of Sri Ramakrishna'—প্রকাশিত হয়েছিল আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটি থেকে। তার ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম। আমরা আলোচনা করছি উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শোভন সংস্করণ—এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদকর্মটি কে করেছেন তা অবশ্য

চিকিৎসক, গবেষক ও সাহিত্যিক

কোথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা নেই। রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজারের অধ্যক্ষ স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী তাঁর 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ জানিয়েছেন, ''গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য এবং অনুবাদটি আদ্যোপান্ত দেখে দেওয়ার জন্য পূজনীয় [চেতনানন্দ] মহারাজের চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।'' কিন্তু লেখকের 'মুখবন্ধ' পড়ে মনে হচ্ছে বাংলা অনুবাদ করেছেন চেতনানন্দজী স্বয়ং, ''এ গ্রন্থ আমি আক্ষরিক বা হুবহু অনুবাদ করিনি। কোনো অংশ হয়তো ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত কিন্তু বাংলাতে বিস্তৃত করেছি। আবার কোথাও ইংরেজিকে বাংলাতে সংক্ষিপ্ত করেছি।'' আর তার আগেই জানিয়েছেন, ''এই অনুবাদে সহায়তা করেছেন অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য।'' (পৃঃ ৯) আমরা যেহেতু এক অনুবাদগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করছি তাই অনুবাদ সম্পর্কে কিছু বলতেই হবে। কিন্তু আপাতত সেই আলোচনা মুলতুবি রেখে মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করি।

গিরিশচন্দ্রকে অনুধাবন করতে তাঁর প্রথম জীবন তথা প্রস্তুতির কথা জানা দরকার। সেই নিয়েই বহু অল্পজ্ঞাত তথ্য সমাহারে সুলিখিত 'শৈশব থেকে যৌবন (১৮৪৪-১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ)' অধ্যায়টি; এবং এই কালপর্বের অন্তর্গত দুই ভিন্ন কর্মোদ্যোগ নিয়ে দুই পৃথক অধ্যায় 'হিসাবরক্ষক রূপে (১৮৬৪-১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ)' আর 'অভিনেতার ভূমিকায় (১৮৬৭-১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ)' এই গ্রন্থের সম্পদ।

গিরিশচন্দ্রের জন্ম ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪ উত্তর কলকাতার বাগবাজারে। বাবা নীলকমল ঘোষ ও মা রাইমণি দেবীর একাদশ সন্তানের মধ্যে তিনি অষ্টম। লেখক মনে করিয়ে দিয়েছেন, ''ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন তাঁর মাতার অষ্টম গর্ভের সন্তান।'' (পৃঃ ৬) গিরিশচন্দ্রের বুঝি তাই ছকভাঙা জীবন, প্রচলিত নিক্তিতে তাঁর বিচার করতে গেলে তল পাওয়া যায় না। নেহাত ছেলেবেলা থেকেই তাঁর এই বৈশিষ্ট্য।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের পাঠ্যক্রম-ভিত্তিক পড়াশোনা আর কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় তাই বালক গিরিশচন্দ্রের দম আটকে আসে। একে একে বিদ্যালয় বদল করে তাঁকে হেয়ার স্কুল, হিন্দু স্কুল এবং শেষে পাইকপাড়া স্কুলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু বিশেষ লাভ হয় না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হন। সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ফলাফল নিয়ে অতি উৎকণ্ঠিত অভিভাবকেরা আশ্বস্ত হতে পারেন। স্কুলজীবনের পরীক্ষায় পাশ করতে না পারা গিরিশচন্দ্রের মেধা নিয়ে কিন্তু সেকালে তাঁর বিদ্যোৎসাহী সহপাঠীরা নিঃসংশয় ছিলেন। তাঁর প্রতিবেশী ও সহপাঠী, পরবর্তী কালের সাব-জজ ''ব্রজবিহারী সোম গিরিশের প্রতিভা ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁকে নিজের মতো করে পড়াশুনা করে স্বকৃত মানুষে পরিণত হতে উৎসাহিত করেছিলেন।'' (পৃঃ ১৩) গিরিশচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন করে ঘরের একান্তে দিনরাত পড়াশোনা শুরু করলেন। সেকালের প্রথা অনুসারে বছর পনেরো বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। সেখান থেকে প্রাপ্ত যৌতুকের টাকা দিয়ে তিনি ক্লাসিক ইংরেজি সাহিত্যের বহু বই কিনলেন। তাঁর অধ্যয়ন শুরু হল এই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য দিয়েই। ক্রমশ এই আগ্রাসী পাঠক ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেন ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে, এমনকী মামা ড. নবকৃষ্ণ বসুর সান্নিধ্যে কিঞ্চিৎ চিকিৎসাশাস্ত্রেও। তার সঙ্গে তাঁর গভীর যুক্তিবোধ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও শৈল্পিক কল্পনাশক্তি যুক্ত হয়ে তাঁকে প্রকৃত জ্ঞানী করে তোলে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। তাঁর ছকভাঙা জেদ ক্রমশ এই জ্ঞানপিপাসুকে এক প্রতিভাবান শিল্পী করে তুলল।

প্রসঙ্গত, কাকে বলে প্রতিভা, প্রতিভাবান কে? স্বয়ং প্রতিভাধর গিরিশচন্দ্রের ধারণাটি মৌলিক এবং বোধগম্য : ''প্রতিভা চলা-পথে চলে না, সে

আপনি আপনার পথ করিয়া লয়। পূর্বে বিলাত হইতে জাহাজ আফ্রিকা ঘুরিয়া ছয় মাসে ভারতবর্ষে আসিত। প্রতিভা সুয়েজ ক্যানাল প্রস্তুত করিয়া ছয় মাসের পথ ছয় সপ্তাহে আসিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেয়।" (পৃঃ ৪৭৫) তাঁর এই ধারণার পাশাপাশি যদি রাখা যায় গিরিশচন্দ্রের নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণ তাহলে বোঝা যাবে কোথায় তাঁর বিশিষ্টতা, প্রতিভার নিজস্ব সংজ্ঞা মেনেই তিনি কেমন উজ্জ্বল হীরকখণ্ড : ''আমি আজীবন এই প্রকৃতি-চালিত হয়ে আসছি। অন্যায় ও কঠিন বলে যে কার্যে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, তা-ই সাধন করতে আমি আগে ছুটেছি।" বলেছেন, ''ভয়ে আমি কোনো কার্য হইতে নিবৃত্ত হই নাই বা যে-কার্যে আমোদ পাই নাই, সে-কার্যে কখনোই প্রবৃত্ত হই নাই।" (পৃঃ ৯) এই প্রবল ইচ্ছাশক্তিই তাঁকে নিয়ত এগিয়ে নিয়ে গেছে। গিরিশচন্দ্রের সহপাঠী, পরবর্তী কালে হাইকোর্টের বিচারপতি, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন উদাহরণ দিয়েছেন, শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ নাটকে ডাকিনীদের (witches) সংলাপ ভাষান্তর করা প্রায় অসম্ভব, সুতরাং গিরিশচন্দ্রের রোখ চাপল তিনি ওই অংশগুলিরই বঙ্গানুবাদ করবেন।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সৃজনশক্তি বারবার বাধা পেয়েছে একের পর এক মৃত্যুশোকে। লেখক জানিয়েছেন তার ভয়াবহতার কথা। গিরিশচন্দ্রের আট বছর বয়সে তাঁর বড়দাদা নিত্যগোপালের মৃত্যু হয়, এগারো বছর বয়সে হারান মাকে, চোদ্দো বছর বয়সে বাবাকে। তারপর থেকে ''শোকের পর শোক গিরিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। প্রমোদিনীর সঙ্গে [১৮৫৯ সালে] বিবাহের দেড় বছরের মধ্যে দিদি কৃষ্ণরঙ্গিণীর মৃত্যু হয়। তাঁর তেইশ বছর বয়সে, স্ত্রী একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দেন। এক মাস পরেই পুত্রটি মারা যায়। পরের বছর তাঁর আর এক দিদি কৃষ্ণকামিনী ও প্রিয় ভাই কানাইলালকে তিনি হারান।... [কয়েক বছর পর তাঁর পঞ্চম শিশু] সন্তানটির মৃত্যু হয়। এরপরে প্রমোদিনী সূতিকা রোগে আক্রান্ত হন। কিছুকালের মধ্যেই গিরিশের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্র মারা যান। কয়েক মাস বাদে চলে যান তাঁর দিদি কৃষ্ণভামিনী। এরপরে আন্তরিক সেবাযত্ন সত্ত্বেও মৃত্যু হয় প্রমোদিনীর। গিরিশের বয়স তখন ত্রিশ।... তিনি দেখলেন, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার—না আশা, না ভালবাসা। ফলে তাঁর বিদ্রোহী মন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।" (পৃঃ ১৪-১৫)

একদিকে চরম হতাশা, অপরদিকে শিথিল পারিবারিক বন্ধন গিরিশচন্দ্রের পদস্খলনের প্রেক্ষাপট। তিনি পানাসক্ত হলেন। তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে এল স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, হঠকারিতা। কিন্তু এহ বাহ্য। শোকের পাথারে নিমজ্জিত হওয়ার যে-সুদূরপ্রসারী প্রভাব গিরিশচন্দ্রের জীবনে সেটি ধরিয়ে দিয়েছেন জীবনীকার চেতনানন্দজী : ''মাদকে যেমন তীব্র দৈনিক যন্ত্রণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়, ছন্দোময়ী ভাষা রচনার প্রয়াস তেমনি তীব্র মর্মবেদনায় ও মানসিক অশান্তিতে মানবকে ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি প্রদান করে। এই ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির আকাঙ্ক্ষায় গিরিশ কবিতা লিখতে শুরু করলেন।" (পৃঃ ২৩) অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রেও সেই আদিকবির মতো, শোক থেকেই শ্লোক।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুছাঁদ অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙে গিরিশচন্দ্র প্রবর্তন করেন অনিয়মিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ—যেটি পরবর্তী কালে 'গৈরিশী ছন্দ' নামে পরিচিত হয়। শুধু কাব্যরচনায় তিনি নিজেকে আটকে রাখেননি, কারণ তিনি মনে করতেন, ''যতপ্রকার রচনা আছে, নাটক রচনা সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস লেখা তাহার নিচে।" (পৃঃ ৪৭৫) আর নাটকে সংলাপ হিসেবে তিনি সফলভাবে ব্যবহার করলেন এই আপাত-অনিয়মিত

ছন্দ-কাঠামো।

গিরিশচন্দ্রের লেখকজীবন শুরু ছত্রিশ বছর বয়সে এবং তা প্রায় তিন দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। বাবা নীলকমল ঘোষ প্রথিতযশা অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ায় সাহেবি সওদাগরি অফিসে হিসাব-পরীক্ষকের চাকরি পেতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। প্রথমে কিছুদিন চাকরির সঙ্গে সমান্তরালেই তাঁর নাট্যচর্চা চলে। তারপর প্রায় পনেরো বছরের চাকরিজীবন ছেড়ে ১৮৭৯ সালে তিনি পুরোপুরি নাটকের জগতে প্রবেশ করেন। তখন তিনি একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা এবং পরিচালক।

নাট্যশিল্পী গিরিশচন্দ্রের এই তিন ধারা নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে : ''অভিনেতার ভূমিকায় (১৮৬৭-১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ)', 'নাট্যকার ও অভিনেতা-১ (১৮৮০-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ)', 'নাট্যকার ও অভিনেতা-২ (১৮৮৫-১৯১২ খ্রিস্টাব্দ)' এবং 'নাট্য পরিচালক' শীর্ষক আলাদা আলাদা অধ্যায়ে।

মঞ্চসফল নাট্যাভিনয়ের রেকর্ডিং সংরক্ষণ করে রাখার কোনও সুযোগ যেহেতু সেযুগে ছিল না, তাই সেকালের দাপুটে মঞ্চাভিনেতাদের সম্পর্কে ধারণা করার জন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিচারণ ছাড়া কোনও উপায় নেই। এখানেও লেখক সেই পথেই হেঁটেছেন এবং কিছু উৎকৃষ্ট স্মৃতিচারণ পরিবেশন করেছেন। যেমন, নন্দলাল বসু নামে বাগবাজারের এক বিখ্যাত জমিদার দুর্গাপূজার প্রাক্কালে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' থেকে বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্রে এতই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁদের দুর্গোৎসবে বলির জন্য রাখা ছাগলগুলিকে মুক্ত করে দেন। আর কখনও তাঁর বাড়িতে পাঁঠাবলি হয়নি। (পৃঃ ৫১) 'ম্যাকবেথ' অভিনয়ের প্রথম রাত্রে এক দৃশ্যে ডানকানকে হত্যা করে ম্যাকবেথরূপী গিরিশচন্দ্র রক্তমাখা হাতে প্রবেশ করলে তাঁর ক্রূর শরীরী ভাষা দেখে দুই প্রবীণ অজ্ঞান হয়ে যান। নাটকের পর নাটকে তাঁর এমন বাস্তব চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নিজের বক্তব্য : ''নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষি-স্বরূপ দেখে যে, তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কি না—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কি না?... মনের যে অংশে অভিনয় চলে, সে অংশের তন্ময়ত্ব প্রয়োজন, মনের যে অংশ সাক্ষি-স্বরূপ থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ, তন্ময় অংশই অধিক।" (পৃঃ ৫৯)

গিরিশচন্দ্র তাঁর সুঅভিনেতা পুত্র সুরেন্দ্র (দানীবাবু)-কে যা বলতেন তা যেকোনও নাট্যাভিনেতার কাছে বেদবাক্য হওয়ার যোগ্য : ''যদি একজনও বিচক্ষণ সমঝদার দর্শক উপস্থিত থাকে তাহলে জানিয়ো সহস্র শ্রোতা উপস্থিত আছে। দেখ না আমি যখন অভিনয় করি শ্রোতার দিকে নজর দিই না, চরিত্রের সাফল্যের দিকে তাকাই।" (পৃঃ ৫৪৮)

অভিনেতা গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে এই গ্রন্থে এক উজ্জ্বল উদ্ধার অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ। তাঁর 'বলিদান' নাটকে পিতা করুণাময়ের চরিত্রে গিরিশচন্দ্র অভিনয় করতেন। একবার হাঁপানির কষ্টে অসুস্থ গিরিশচন্দ্রের পরিবর্তে আর এক জনপ্রিয় নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এই চরিত্রে কয়েক রাত্রি অভিনয় করেন। ফলে অপরেশবাবুর মতো নিবিষ্ট দর্শক এই দুই দিকপাল অভিনেতার তুলনা করার সুযোগ পান : ''যে-দৃশ্যে হিরণ্ময়ী পুকুরে ডুবিয়া মরে, সেই দৃশ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া অর্ধেন্দুশেখর মমতাবিগলিত চক্ষের ধারে বক্ষ ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, ''এই যে, খুঁজে পাওয়া গিয়েছে! তাইতো বলি, আমার শান্ত মেয়ে, রাস্তায় যাবে না" ইত্যাদি। এ ক্রন্দনে দর্শকও

কাঁদিতেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেন, তখন তাঁহার চক্ষে জল কোথায়! দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, শোণিতপ্রবাহ স্তব্ধ, নিষ্পলকনেত্রে জমাটবাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভগ্ন, গভীর!... গিরিশচন্দ্রের করুণাময় দর্শককে অনুসরণ করিত, অভিনয়ান্তে—পথে, গৃহদ্বারে, অন্ধকার শয়নকক্ষে, আহারে নিদ্রায় স্বপ্নে, অভিনয় দেখার দু-তিন দিন পরেও এ করুণাময়ের প্রভাব দর্শককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত।" (পৃঃ ৭১)

যখন নাটক লিখছেন তখন জ্ঞানচর্চার দীর্ঘ প্রস্তুতি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁর প্রধান রসদ তো বটেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর এই সংবেদনশীল অভিনয়বোধও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের এক বড় চালিকাশক্তি। তা বুঝতে পারা যায় তাঁর লিখনভঙ্গি থেকে, যে-সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী গুণমুগ্ধরা সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ করে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে চেতনানন্দজী তার অনেকগুলিরই হদিশ দিয়েছেন। প্রথম উল্লেখ করি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের বয়ান : ''গিরিশচন্দ্র বলিতেন, ভাব প্রত্যক্ষভাবে সম্মুখে না দাঁড়াইলে তিনি এরূপ সুস্পষ্টভাবে কোনো বিষয় বর্ণনা করিতে পারিতেন না। যখন তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন, তখন বাহ্যিক কোনও জ্ঞান থাকিত না, কোনোরূপ দ্রব্যাদিও দেখিতে পাইতেন না। লিখিবার সময়ে এক বারের বেশি দুইবার বলিতে পারিতেন না। কারণ, ভাবসকল ছায়াচিত্রের ন্যায় জীবন্তভাবে তাঁহার সম্মুখ দিয়া এত দ্রুত চলিয়া যাইত যে, এক বার কথাটি ছাড়িয়া গেলে দ্বিতীয়বার তাহার পুনরুক্তি করা সম্ভবপর হইত না। সেইজন্য তিনি স্বহস্তে লিখিতে পারিতেন না। লিপিকার ক্ষিপ্রহস্তে সেই বর্ণনাগুলি লিখিয়া লইতেন।" (পৃঃ ৫১) গিরিশের লিখনপ্রতিভা নিয়ে অনেক গল্প আছে। শোনা যায় তিনি দুদিনের মধ্যে একটা নাটক লিখতে পারতেন। 'সীতার বনবাস' এক রাত্রিতে লেখা হয়েছিল। আবার এক রাত্রির মধ্যে তিনি 'সধবার একাদশী'-র ছাব্বিশখানা গান রচনা করেন। 'Days in an Indian Monastery' গ্রন্থে সিস্টার দেবমাতা লিখেছেন, ''গিরিশের পাঁচ অঙ্কের দীর্ঘ নাটক 'সাধু বিল্বমঙ্গল' একটানা আঠাশ ঘণ্টার অক্লান্ত পরিশ্রমে রচিত হয়।" স্বামী সুবোধানন্দ বলেন, ''এমনও দেখেছি—গিরিশবাবু একসঙ্গে তিন জন লেখককে তিনটি বিভিন্ন নাটকের বিষয়বস্তু বলে যাচ্ছেন এবং তারা তা লিখে যাচ্ছে।" মনে পড়বেই বাংলা সাহিত্যের আর এক অমিত প্রতিভাধর মাইকেল মধুসূদনের কথা। ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য পুরাণ বা কোনও মহাকাব্য অবলম্বনে নাটক লেখার সময় তিনি কখনও এক-একটির জন্য এক সপ্তাহের বেশি সময় নিতেন না। (পৃঃ ৪৫) এই ন্যাশনাল থিয়েটারে দু-বছর ম্যানেজার থাকাকালীন গিরিশচন্দ্র প্রতি দুমাসে একটি করে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেন। (পৃঃ ৪৬)

কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ করা মানে তো শুধু নাট্যরচনা নয়, সামগ্রিক পরিচালনাও। কেমন ছিল তাঁর পরিচালন পদ্ধতি? এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সেক্রেটারি (১৮৯৯-১৯১২) অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণটি অত্যন্ত মূল্যবান : ''...গিরিশচন্দ্র প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষতঃ নাটকীয় বড়-বড় চরিত্রের অভিনয় কীরূপ হইবে, তাহা অনেকটা শিক্ষার্থীদিগের স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই শিখাইতেন। যাঁহার কণ্ঠে যেভাবে বলিলে সহজে দর্শকের ও অভিনেতার হৃদয়গ্রাহী হয়, অঙ্গভঙ্গি বা ভাবের অভিব্যক্তি কোন্ অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি, মুখ ও নয়নের ভঙ্গিতে সুন্দর হয়, সুপরিস্ফুট হয়—সেইদিকে তাঁহার খরদৃষ্টি থাকিত, অর্থাৎ অভিনয়কলা-বিকাশে যাঁহার যতটুকু শক্তি বা সামর্থ্য—তাঁহার সেই শক্তি ও সামর্থ্যের যাহাতে অনুশীলনের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়,

সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। কাহারও মৌলিকতা (originality) নষ্ট করিয়া কেবলমাত্র অনুকরণ-পটু করিতে তিনি চাহিতেন না।... শিক্ষাদানকালে যেমন, তেমনই আবার নাটক লিখিবার সময়েও গিরিশচন্দ্র নিজ দলের প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের আবৃত্তি ও অভিনয় করিবার ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকের ভাব ও ভাষা রচনা করিতেন।" (পৃঃ ৪৮৬)

হ্যাঁ, অভিনেত্রী। নারীচরিত্রে পুরুষের অভিনয় করার রীতি ভেঙে গিরিশচন্দ্র নাট্যমঞ্চে অভিনেত্রীদের নিয়ে আসেন। তার জন্য সামাজিক বাধাকে তিনি গ্রাহ্যে আনেননি বলেই বাংলা রঙ্গমঞ্চ বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ির মতো সমর্থ অভিনেত্রীদের লাভ করেছিল। তাঁদের যথোচিত গুরুত্ব দিতে গিরিশচন্দ্রের এই তিন শিষ্যাকে নিয়ে এই গ্রন্থে এক আলাদা অধ্যায় 'তিন বিখ্যাত নায়িকা'। তিনকড়ি কৃতজ্ঞচিত্তে বারবার তাঁর গুরুর কথা স্মরণ করতেন : ''সম্পূর্ণ নিরক্ষর মেয়ে ছিলাম। শুধু তাঁরই (গিরিশচন্দ্রের) দয়ায় আজ আমি একজন অভিনেত্রী।" (পৃঃ ৯০) তাঁর লেডি ম্যাকবেথ, জনা, সুভদ্রা, শ্রী প্রভৃতি ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় তখন বাঙালি নাট্যমোদীদের আবিষ্ট করে রাখে।

শুধু নাট্যকলার কৃতিত্ব অর্জন নয়, গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মানুষ হিসেবেও এতটা উচ্চে উঠেছিলেন যে নানা সৎ উদ্দেশ্যে তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে নাটকের শো করতেন—তা কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের অর্থ সংগ্রহ করার জন্যই হোক বা ঋণগ্রস্ত রজনীকান্ত সেনের অর্থসাহায্যের জন্যই হোক, অথবা কাশী সেবাশ্রম, ভুবনেশ্বর আশ্রমের সাহায্য-রজনীই হোক।

লেখক চেতনানন্দজী সঠিকভাবে খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন, ''এ-সবের সূত্রপাত সেই 'চৈতন্যলীলা' থেকে" অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাট্যাভিনয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি।

গ্রন্থনামেই স্পষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ-গিরিশচন্দ্র সম্পর্ক লেখকের মূল উদ্দিষ্ট। ক্রিস্টোফার ইশারউড তাঁর ''ভূমিকায় খুব সংক্ষেপে এই বিষয়টি ধরিয়ে দিয়েছেন : ১৮৮০ সাল নাগাদ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখে যে গিরিশচন্দ্রের মনে হয়েছিল 'কী ভণ্ড! ঢং করছে"—সেই গিরিশচন্দ্র সম্পর্কেই বিবেকানন্দ বলেছেন, ''গিরিশের মতো কেউ তার অহংকে সম্পূর্ণরূপে প্রভু [শ্রীরামকৃষ্ণ]-র পায়ে সমর্পণ করতে পারেনি।" (পৃঃ ১৫-১৯) সন্দিহান থেকে 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' ভক্তির জ্বলন্ত বিগ্রহ হয়ে ওঠার এই যাত্রাপথ বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত : বস্তুত ৫৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে ১০৬-৪৭৪ পৃষ্ঠা জুড়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টিই আলোচিত।

এই বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে 'নাস্তিক থেকে আস্তিক ভক্ত (১৮৬৭-১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ)' শীর্ষক অধ্যায়টি দিয়ে। তারপর আলাদা আলাদা অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'বৃষকেতু', 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তার মঞ্চায়নের কালে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগ উল্লেখিত। সেই সূত্রে এসেছে পরবর্তী দুই অধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ : বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের দেবতা' এবং 'তিন বিখ্যাত নায়িকা'। গিরিশচন্দ্র প্রায় নব্বইটি নাটক লিখেছেন, তার মধ্যে বেশিরভাগই শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের পরে লেখা। (পৃঃ ২৫১) এর মধ্যে বিশেষভাবে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'রূপ-সনাতন', 'কালাপাহাড়', 'পূর্ণচন্দ্র' এবং 'নসীরাম' নাটকগুলি নিয়ে একটি অধ্যায় 'গিরিশ-নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব'। গিরিশচন্দ্র লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি' এবং 'কথামৃত' থেকে সংগৃহীত 'শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথন' এই বইয়ের আয়তন বৃদ্ধি করলেও,

পাশ্চাত্য পাঠকের কথা ভাবলে এই সংযুক্তি যথাযথ। এরপর, বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা, স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য ও গৃহী ভক্তদের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বিশিষ্ট মানুষের স্মৃতিকথা আলাদাভাবে সংকলিত। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণী থেকে বিভিন্ন অধিবেশনে গিরিশচন্দ্রের বক্তব্যও সংকলিত। স্পষ্টতই এই গ্রন্থের এক বৃহৎ অংশ লেখকের নিজের রচনা নয়, কিন্তু তাঁর সন্ধানী চোখ এবং গবেষক মন গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দুই মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে।

আপশোসের কথা, এই পরিশ্রমী গবেষণা-কর্মটির শেষে কোনও ইনডেক্স নেই। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে এই বিষয়ে নজর দেওয়া হবে। পরবর্তী সংস্করণের কথা ভেবেই কয়েকটি কথা।

স্বামী চেতনানন্দজীর মূল্যবান কিছু ইংরেজি বই আছে যেগুলির বঙ্গানুবাদ হওয়া খুব দরকার। শুধু যে ইংরেজিতে অস্বচ্ছন্দ বাংলা পাঠকের কথা ভেবে একথা বলা হচ্ছে তা নয়। আসলে এই গ্রন্থগুলিতে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত আকরগ্রন্থগুলি অধিকাংশই বাংলায় লেখা, ইংরেজি গ্রন্থে ব্যবহার করার জন্য চেতনানন্দজী সেগুলির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। মহারাজের বইগুলি বাংলায় অনুবাদ করলে উদ্ধৃতিগুলি মূল গ্রন্থ থেকেই অবিকল ব্যবহার করা যাবে। চেতনানন্দজীর 'God Lived with Them', 'They Lived with God' বইগুলি সম্পর্কে তাই বঙ্গানুবাদের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। একই কথা আলোচ্য বইটি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এবং এটির বঙ্গানুবাদ তাই অবশ্যই স্বাগত।

কিন্তু এই বইটিতে মূল আকরগ্রন্থ থেকে অবিকল উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কিছু সমস্যা আছে। মহারাজ সেকথা 'মুখবন্ধে'ই স্বীকার করেছেন : ''যে অংশগুলি আমি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলাম সেগুলির original এই গ্রন্থে দেওয়া হল। এর ফলে বর্তমান গ্রন্থে সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ হয়েছে। এজন্য পাঠকদের কাছে মার্জনা চাইছি।" (পৃঃ ৯) এই কুণ্ঠার কারণ বুঝতে পারা যায় বইটি পাঠ শুরু করার কিছু পর। আসলে, এই অধ্যায়গুলির অধিকাংশেই দীর্ঘ দীর্ঘ উদ্ধৃতি রয়েছে। ফলে পড়তে গেলে দেখা যাচ্ছে অধ্যায়টি যেন প্রাচীন সাধুভাষাতেই রচিত, শুধু কিছু কিছু বাক্য মাঝে মধ্যে চলিত ভাষায় এসে সাবলীলতা ব্যাহত করছে।

চেতনানন্দজীর বহু ইংরেজি গ্রন্থেরই যে আশু বঙ্গানুবাদ প্রয়োজন বলছিলাম, সেই কাজে হাত দেওয়ার সময় এই সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে ভাল হবে।

মূল ইংরেজি গ্রন্থনামের বাইলাইনে ব্যবহৃত 'Bohemian' শব্দটি বাংলা নামে রেখে দেওয়ার সংযম সাধুবাদযোগ্য।

গিরিশচন্দ্রের এক আশ্চর্য আত্মবিশ্বাসী উক্তি সব শেষে উদ্ধৃত করি : ''আমার মুশকিল হইয়াছে কি জানো—আমার আপনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা।... আমায় প্রতিবার উদ্যম করিতে হয়, আপনাকে আপনি কেমন করিয়া হারাইব।" (পৃঃ ৪৭৮) ক্রমশ নিখুঁততর হওয়ার এই আকুতি যেন আমরা আমাদের সাধ্যমতো অর্জন করতে পারি।